***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's***
*Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 212 – 217*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848*

# মহাকালের খাঁড়া : নকশাল প্রেক্ষিত ও আখ্যানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শুচিতা সিং
এম. ফিল, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : ssuchita90@gmail.com

## Keyword
পশ্চিমবঙ্গ, নকশাল আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা, মুক্তিযুদ্ধ।

## Abstract
কথাসাহিত্যিক কায়েস আহমেদ পশ্চিমবাংলার হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করে দেশভাগের ফলে শিকড় ছেঁড়ার যন্ত্রণা নিয়ে থিঁতু হয়েছিলেন ঢাকা শহরে, আর ফেরা হয়নি। ফেরা না ফেরার দ্বন্দ্বই তাঁর কলমের ডগায় স্থান করে নিয়েছিল। যার ফসল *অন্ধ তীরন্দাজ* (১৯৭৮), *লাশকাটা ঘর* (১৯৮৭), *নির্বাসিত একজন* (১৯৮৬), *দিনযাপন* (১৯৮৬) প্রভৃতি আখ্যান। *লাশকাটা ঘর* গল্পে নাগরিক জীবনের নিত্য দিনের অভাব মানুষের মনে কতটা ক্ষতের সৃষ্টি করে তার প্রমাণ কালীনাথ। ক্ষতের মধ্যে আরামের প্রলেপ দিতেই কালীনাথ শেষরাতে সদর দরজা খুলে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে চায়। *অন্ধ তীরন্দাজ* গল্পে কয়েকজন হতাশাগ্রস্থ যুবকের কাজ নেই, জমি নেই, খাবার নেই অথচ রয়েছে ঘরে মা বাবা স্ত্রী সন্তান। জীবন নির্বাহের কোনো অবলম্বন নেই। যাদের চোখে শুধুই স্বপ্ন। তাই সগু, পচা, নিতাই অভাবে স্বভাব নষ্ট করে রেশনের মাল পাচার শুরু করে। *মহাকালের খাঁড়া* গল্পে ভরত কোলের জীবনের অন্তিম পরিণতি ঘটে ছেলে সুরেনের মধ্য দিয়ে।

কায়েস আহমেদের প্রত্যেকটি রচনাই সত্তরের দশকের গতানুগতিক ন্যারেটিভ ফর্মকে ভেঙ্গে তৈরি করেছিল আখ্যানের নতুনত্ব। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিকের সঙ্গে মানুষ কতটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেটাই মূলত তিনি দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন। বিরামহীন ট্রেনের গতির মতোই মানুষের জীবনের গতিকে বর্তমান সময়ের আবহে সম্বল করে বিলিয়ে দিয়েছেন পাঠকের মাঝে। এভাবেই কায়েস আহমেদ আমাদের নিয়ে যান বাস্তবের কুহকময় জগতে।

বাংলা ছোটোগল্পের বৃত্ত-পরিধি প্রসারে কায়েস আহমেদ ব্যতিক্রমী শিল্পী স্রষ্টা। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে ভিন্ন প্রকরণ কৌশলে নিজের বিশেষত্ব প্রমাণ করেছেন। লেখকের বয়ান থেকেই এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

১৯৭০-পরবর্তী বাংলাদেশ তো আর আগের মতো নেই, এতো বিচিত্র ওলট-পালট আগের মতো থাকতে পারে না। এই পরিবর্তিত বাস্তবতাকে ধরতে নতুন আঙ্গিকেই ধরতে হবে। কিন্তু নতুন আঙ্গিকে ধরতে হলে প্রথমেই চিনতে হবে এই বাস্তবতার স্বরূপটিকে, তাকে যদি যথাযথভাবে সনাক্ত করা যায়, তখনই আসবে তাকে ধরার কলা-কৌশলের প্রসঙ্গটি।

এই বক্তব্যের দ্বারাই স্পষ্ট হয় তাঁর মানসলোক ভিন্ন পথ অনুসন্ধানী। নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের স্পষ্ট নগ্নতার দিকে আঙ্গুল তুলেছিলেন তাঁর আখ্যানের মধ্য দিয়ে। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আখ্যানভাবনা কতটা গ্রহণযোগ্য তা *মহাকালের খাঁড়া* গল্প অবলম্বনে অনুসন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। আলোচ্য দিক বিবেচনায় কায়েস আহমেদের গল্প বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ করা যেতে পারে।

## Discussion

**এক**

দেশভাগ উত্তরকালে বাস্তুহারা মানুষ যেমন ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এসেছে তেমনি এপার বাংলা থেকে মুসলমান হওয়ার কারণে অনেককে ওপার বাংলায় চলে যেতে হয়েছে। আর দেশভাগের কারণে সাধারণ মানুষের মতো কবি-সাহিত্যিকদেরও দেশ ছাড়তে হয়েছে, বাস্তু ছাড়তে হয়েছে। রাঢ়ের কথাকার হাসান আজিজুল হকের মতো মুসলমান হওয়ার কারণে কায়েস আহমেদকেও (১৯৪৮-১৯৫২) পূর্ব পাকিস্তানে চলে যেতে হয়েছে। দেশভাগের শিকার হওয়া সাহিত্যিকদের মধ্যে কায়েস আহমেদ এক ব্যতিক্রমী কথাশিল্পী। ব্যতিক্রমী এ কারণেই, তাঁর আখ্যান ভাবনায় কোনও ধারাবাহিক রূপ নেই। ব্যক্তিজীবনের মানসিক অস্থিরতা, উদাসীনতা, বিষাদ তাঁর সাহিত্য জগতকে প্রভাবিত করেছে। কায়েস আহমেদের জীবনকালে ১৯৪৭-এর দেশভাগ পরবর্তী সংকট, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত তাঁর সাহিত্য জগতকে ভিন্ন ভিন্ন পথে চালিত করেছে। ফলত তার সাহিত্য জগত জুড়ে ভিড় করেছে নানা সামাজিক প্রেক্ষিত আর বাস্তবতা। তাঁর রচনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সময়, সময়ে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার প্রেক্ষাপট। সেই সঙ্গে যুদ্ধ উত্তর বাস্তবতা, মানুষের-বেদনা-দুঃখ-যন্ত্রণা-হতাশা-সামরিক শাসনের উত্থান প্রভৃতি স্বীকার করেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হয়েছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে কায়েস আহমেদের রচনাভাণ্ডার স্বল্প হলেও তাঁর রচনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য কিন্তু একেবারে স্বতন্ত্র। পাঠকের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন তাঁর উদ্দেশ্য নয়, বরং নিজের লেখার মধ্যে নিখুঁত বাস্তবতাকে পরিমার্জন রূপ দেওয়াই লক্ষ্য। আসলে তিনি নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন মানব জীবন নিয়ে। নর-নারীর দেহ সম্পর্কের বাইরেও যে মানব জীবনে এত বর্ণচ্ছটা তা কখনো রঙিন, কখনো ফিকে এই সহজ সরল দিকটিকেই তিনি ধরতে চেয়েছেন অন্য সাহিত্যিকদের তুলনায় পৃথকভাবে। নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েছেন মনস্তত্ত্বকে বোঝার তাগিদে। মানব জীবনের প্রতি স্বতন্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাই তাঁর প্রত্যেক লেখাকে পাঠকের মনে ও মননে স্নিগ্ধ স্পর্শকাতর করে তুলেছে। তাই খুব কমসংখ্যক লেখা নিয়েই কায়েস আহমেদ হয়ে উঠেছেন এক কালোত্তীর্ণ শিল্পীসত্তা।

তাঁর রচনার মধ্যে আছে গল্প, উপন্যাস, জীবনীগ্রন্থ, কবিতা ও প্রবন্ধ। তবে গল্প লেখক হিসাবেই তিনি বেশি পরিচিত। কায়েস আহমেদের রচনাগুলি হল *অন্ধ তীরন্দাজ* (১৯৭৮), *দিনযাপন* (১৯৮৬), *নির্বাসিত একজন* (১৯৮৬), *লাশকাটা ঘর* (১৯৮৭)। প্রথম গল্পগ্রন্থ *অন্ধ তীরন্দাজ*-এর রচনাকাল ১৯৭৩-১৯৭৭ সাল অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকাল। এই সময়কালে লেখক বাংলাদেশের শহর ও গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা-হতাশা-নিঃসঙ্গতাকে তুলে ধরেছেন রচনার মধ্য দিয়ে। এই গল্পগ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই স্থান পেয়েছে রেললাইন ও স্টেশনের প্রসঙ্গ। লেখকের চোখে রেলগাড়ি গতির প্রতীক, যার মাধ্যমে তিনি মানুষের জীবনের গতিকে ধরতে চেয়েছেন আর অন্যদিকে স্টেশন হল স্থিরতার প্রতীক। স্থিরতা হল নিঃসঙ্গতা, মানুষের একাকীত্ব জীবন, নিঃসঙ্গের জীবনকেই লেখক ধরতে চেয়েছেন।

তাঁর গল্পে মৃত্যু নানা রকমভাবে এসেছে কখনো আত্মহত্যা বা কখনো স্বাভাবিক মৃত্যু। *বন্দী দুঃসময়, গন্তব্য, বেঁচে থাকার শতেক জ্বালা* প্রভৃতি গল্পে বারবার মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে। *অন্ধ তীরন্দাজ* গল্পে কয়েকজন যুবকের কথা এসেছে, যাদের কিছু নেই অর্থাৎ কাজ নেই, জমিজমা নেই, ঘরে খাবার নেই অথচ মা-বাবা-স্ত্রী-সন্তানদের দায়িত্ব রয়েছে কাঁধে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সগু, পচা, নিতাই এবং নাড়ু এঁরা গল্পের নায়ক। অভাবে এঁদের স্বভাব নষ্ট হয়েছে। এঁরা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়েছে। এভাবেই কায়েস আহমেদ জীবনের চরম সত্যকে উদ্ঘাটন করেছেন। নিজের জীবন দিয়ে এ সত্যকে লেখক উপলব্ধি করেছেন। *অন্ধ তীরন্দাজের* পর প্রায় এক দশক পর *লাশকাটা ঘর* প্রকাশ পেয়েছে। এই সময়ে ঘটে গেছে নকশাল আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ। ফলে এই গল্পগ্রন্থের স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পালাবদল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

## দুই

কায়েস আহমেদের বেশিরভাগ গল্পে এসেছে নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গ। ফলে মানুষের মধ্যে থাকা অস্থিরতা, ভয়, দুশ্চিন্তা এবং প্রতিবাদী মনোভাব তাঁর গল্পগ্রন্থে উঠে এসেছে। *লাশকাটা ঘর* গল্পে ঢাকার পুরনো বাড়িতে কিছু নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের যাপিত জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জীবনের পাওয়া না পাওয়া থেকে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তা চিত্রায়িত হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কালীনাথ, এই কালীনাথকে পাওয়া যায় নীরব বাঙ্ময় রূপে। কিন্তু গল্পের শেষে কালীনাথের আত্মহত্যার পথ ব্যক্তিমানুষের যন্ত্রণার সরবতা দাবি করে। এই সংলাপহীন গল্পই সক্রিয় হয়ে ওঠে নীরবতার মধ্য দিয়ে। এ বিষয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মন্তব্য;

> "প্রথম বইতে দেখি, গল্প বলার, জমিয়ে গল্প বলার একটি রীতি তিনি প্রায় রপ্ত করে ফেলেছেন। আভাস পাওয়া যায় এই রীতিটি দাঁড়িয়ে যাবে একটি পরিণত ভঙ্গিতে, পাঠককে সেঁটে রাখার জাদু তিনি ঠিক আয়ত্ত করে ফেলেছেন।...পরের বইতেই নিজের রীতিকে, রপ্ত কিংবা প্রায়-রপ্ত রীতিকে অবলীলায় ঠেলে কায়েস পা বাড়িয়েছেন নতুন রাস্তার দিকে। তাঁর এসব কাণ্ড কিন্তু আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য নয়, মানুষের গভীর ভেতরটাকে খুঁড়ে দ্যাখ্যার তাগিদেই একটির পর একটি রসায়ন, তাঁর ক্লান্তিহীন পদসঞ্চার।"[১]

প্রত্যেক রচনার একটি প্রেক্ষাপট থাকে সেই প্রেক্ষাপটকে একজন কথাসাহিত্যিক তাঁর রচনায় তুলে ধরতে চান। ঠিক তেমনই কায়েস আহমেদের *মহাকালের খাঁড়া* গল্পটিতে রয়েছে ষাটের দশকের শেষে ঘটে যাওয়া নকশাল আন্দোলনের ছোটো-বড়ো নানা ঘটনা। গল্পের প্রথম দিকে 'শ্রেণি শত্রু খতম চলছে চলবে'-এই শ্লোগানই যেন গল্পের একটা প্রাথমিক পরিচয় পাঠকের কাছে তুলে ধরেছে। নকশালবাড়ি গ্রামের কৃষকদের ওপর ভূস্বামীদের অকথ্য অত্যাচার মূলত নকশাল আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু নকশালবাড়ি থেকে ক্রমেই আন্দোলন ছড়িয়ে পরেছে ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। পরবর্তীতে আন্দোলন কলকাতা শহরমুখী হয়ে পড়ে। *মহাকালের খাঁড়া* গল্পের প্রধান চরিত্র ভরত কোলে। গল্পের শুরুতেই; 'ভরত কোলে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে', এই ভয়ের পিছনে যে কারণ তাই সমগ্র গল্পে উঠে এসেছে।

কায়েস আহমেদ *মহাকালের খাঁড়া* গল্পে ভরত কোলের সাংসারিক জীবনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে নকশাল আন্দোলনের দিকগুলোকে তুলে ধরেছেন। আন্দোলনকালীন সময়ে নকশালদের চোখে শ্রেণিশত্রুদের পরিণতি কি ছিল তাই আমরা প্রত্যক্ষ দেখি ভরত কোলের একমাত্র ছেলে সুরেনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। গল্পের শুরুতেই; 'ভরত কোলে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে'। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত আন্দোলনের খবর যেন ভরত কোলেকে পেয়ে বসে; খবরের কাগজে, তারপর বাজার, হোটেল, রেলগাড়ি, বাসে নকশাল আন্দোলনের ক্রিয়া-কলাপ ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দিকে। ধানক্ষেতের আলের পাশে নিজেদের প্রমাণ রেখে ধান কেটে নিয়ে যায়, সুযোগ মতো ফাঁকা পেলেই তাঁদের চোখের শত্রুকে শেষ করে দিয়েছে। আন্দোলন যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন 'শ্রেণি শত্রুর' পক্ষ নিয়েছে পুলিশ। কিন্তু আন্দোলনকারীরা

পুলিশকেও দেখে ভয় পায়নি; 'পুলিশের সঙ্গে পাইপগান নিয়ে সামনা-সামনি লড়াই' করেছে। ভরত কোলে সমস্ত খবর শোনার পর ভেতরে ভেতরে সিটকে যায়। কারণ সে বুঝতে পারে সমাজে তাঁর স্থান কোথায়। ফলে ভরত কোলে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও লোকের মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারে না, তাকালেই যেন অসৎ উপায়ে সে যে টাকার পাহাড় করেছে তা মানুষের চোখে ধরা পরে যাবে। তাই নিজেকে বা নিজের ছেলেকে সমাজ থেকে একরকম লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে। ভরত কোলে কোনও কিছুতেই আর স্বস্তি পায় না; 'বাড়িতে ফিরেও স্বস্তি পায়নি'।

ভরত কোলে খুব সহজেই বুঝতে পারে তাঁর ধন-সম্পত্তিতে তাঁর মতো একমাত্র ছেলে সুরেনও সমাজের কাছে 'শ্রেণি শত্রু' হয়ে ওঠে। ফলে সুরেনকেও যে কোনও সময় 'ওরা' শেষ করে দিতে পারে। তাই ভরত কোলে বারবার তাঁর ছেলেকে সাবধান করে দিয়েছে আড়ালে আবডালে ডেকে, বারবার সতর্ক করে দেয়;

> "খবরদার, কোন ঝুট-ঝামেলায় যাবি না, খদ্দেরের রাগ-ঝাল করবি না, আর আড্ডা বসাবি না দোকানে, রাজনীতি-ফাজনীতির আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করবি না। এতোগুলো 'না' চব্বিশ বছরের জোয়ান তাগড়া ছেলেটা কিভাবে নিচ্ছে বুঝতে পারে না ভরত।"[২]

## তিন

গল্পকার সমগ্র গল্পে ভরত কোলের জীবনের খুঁটিনাটি তুলে ধরেছেন এবং কীভাবে ভরত কোলে নিজেকে 'শ্রেণি শত্রু' করে তুলেছে তারও বর্ণনা করেছেন- ভারত কোলে জীবনের প্রথম দিকে শ্রীরামপুরে জুতোর দোকান মাস মাইনে চাকরি করতো। কিন্তু পরে সনকা, বারুইপাড়া, বাকসা, মনিরামপুর, আদান, জনাই, বেগমপুর, চন্ডীতলা, গরলগাছা, হাটপুকুর, কুমোরপাড়া, প্রভৃতি জায়গায় তার ব্যবসা চলেছে কুড়ি বছর ধরে। বেগমপুরের পটলা সঙ্গে মিলে ভরত কোলে নতুন ব্যবসা ধরে। যেমন ব্যবসাই হোক না কেন টাকাই তাঁর কাছে শেষ কথা, ফলে কোনও ব্যবসাতেই ভরত কোলের 'না' নেই। তাই সে পটলাকে বলেছে; 'আমি রাজি, পটলা তুই লাইন কর'। পটলাকে- 'রেলের ওয়াগান ভাঙা দলটার সঙ্গে' যোগাযোগ করতে বলেছে। নতুন ব্যবসা যতোই কঠিন হোক না কেন ভরত কোলের কাছে টাকা কামানোই যেহেতু শেষ কথা, তাই গল্পকারও কঠিন কাজের বর্ণনাও সহজ করেই দিয়েছেন;

> "কাজ এমন কিছু নয়, মানুষ এসে জিনিস দিয়ে যাবে, সেই জিনিস জায়গা মতো পৌঁছে দিতে পারলেই করকরে নোটের তাড়া। ঝুঁকি অবশ্য বড্ড বেশি। তা ঝুঁকি নেই কিসে?"[৩]

লোক দেখানো গমকলটাও ঠিক রেখেছে সে এবং মদের কারবারও চালিয়েছে রমরমিয়ে। মদ বিক্রি করে হাজার লোককে মাতাল করেছে, কিন্তু সে নিজে কোনোদিনও মাতাল হয়নি, মেয়ে মানুষের নেশাও নেই, নেশা যা আছে তা হল কেবল মাত্র টাকা করা, সম্পত্তি করা। বহু পরিশ্রম করে, ফন্দি করে, টাকা বিষয়-সম্পত্তি করেছে ভারত কোলে। তিনতলা বাড়ি, সামনে থান বাঁধানো পুকুর, গোয়ালে গরু, চাকর-বাকর আশ্রিত পুষ্যি, ঝি দাসী নিয়ে তাঁর ভরপুর সংসার। সুরেনের মায়ের কথায় ভরত কোলের ঘরে 'লক্ষ্মী বাধা' পরলেও টাকা আর সম্পত্তি করার নেশাটাই তাকে পেয়ে বসেছে;

> "নেশার কথাই যদি বলো, তাহলে মানুষের সবচেয়ে বড় নেশাটাই আছে ভরতের, টাকা করা সম্পত্তি করা।...সেই টাকা আর সম্পত্তি এখন শতমুখী রাক্ষস হয়ে তাকে গিলতে আসছে।"[৪]

ভরত কোলে জুতোর দোকানের শ্রমিক থেকে অক্লান্ত পরিশ্রমে ধনপতি হয়ে ওঠে অসৎ পথে। বিপুল বিষয় সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠার সমান্তরালতার মধ্যে ছেদ পড়ে গল্পের এই লাইনের মধ্য দিয়ে। ফলে; 'একমাত্র ছেলেও তার বুকের কাটা'। ভরত কোলের একমাত্র ছেলে সুরেন, সমাজতন্ত্রীদের ভয়ে তাঁর বাবার ঘুম উড়ে গেলেও সে বুঝতে

পারেনা বাবার অযথা ভয়ের কারণ কি। হরি, সুদীপ, অনাদি, ঝন্টু সুরেনকে মারার জন্য প্লান করে। বাঁশ বাগানের মধ্যে সুরেনকে দেখতে পেয়ে তাঁরা চাপা সোল্লাসে বলে 'আরেশ্বালা গোলাপ তুমি এখানে'। চারটে ড্যাগার সুরেনের সামনে ঝকঝক করে ওঠে, সুরেন ভয় পায়। ঝন্টু প্রথম ড্যাগার দিয়ে সুরেনের পিঠে আঘাত করে। সুরেনকে মারার পর কেন যে সে বউয়ের বাচ্চা হওয়ার কথা বলে, বাপ হতে চায়। অথচ, সুরেন গোপীদত্তের মেয়ে সবিতাকে ভালোবেসে ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সন্তান পৃথিবীতে আসতে পারেনি। হরি ড্যাগার দিয়ে সুরেনের কুঁকড়ে যাওয়া শিশ্ন ইলাস্টিকের মতো টেনে লম্বা করে দুবার পোঁচ দেয়। ঝন্টু একটি শুকনো কঞ্চির মধ্যে লিঙ্গটিকে গেঁথে দেয়। এবার তাঁরা চার ইঞ্চি লম্বা কাগজ 'গলা কাটা চলছে চলবে' লেখা সুরেনের বাঁ কাঁধ থেকে বুকের ওপর বিছিয়ে দেয়।

**চার**

কায়েস আহমেদের *মহাকালের খাঁড়া* গোটা গল্পের দুটি পরিসর। এক, ভরত কোলের সাধারণ মধ্যবিত্ত অবস্থা থেকে ধনবান হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত আর সুরেনের মৃত্যুর রোমহর্ষক বর্ণনা। গল্পটির সূচনা থেকেই ভরত কোলের হাবভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল সুরেনের মৃত্যুর। এ যেন ঠিক 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'। ভরত কোলের টাকার প্রতি লোভ লিপ্সাই সুরেনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভরত কোলেকে স্বস্তি দেয় না, বরং সে নিজেই নিজের কাছে দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) *পুতুল নাচের ইতিকথা* উপন্যাসে বলেছিলেন; 'মানুষ ভাবে এক হয় আরেক, চিরকাল এমনটাই হয়ে এসেছে। মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি'। *মহাকালের খাঁড়া* গল্পে কায়েস আহমেদ যেন এই কথাই বলতে চেয়েছেন। ভরত কোলে কোনোদিন ভাবতে পারেনি তাঁর সারাজীবনের অন্যায়-অবিচার, মিথ্যা চালাকি একদিন এভাবে পৌঁছে যাবে নিজের ঘরে। আসলে আমাদের প্রত্যেক মানুষের জীবনে আমরা যেমন কর্ম করি তেমন ফল পাই আজ না হোক কাল। বাবা-মায়ের সু-কর্মের ফল যেমন সন্তান ভোগ করে তেমনি কু-কর্মের ফলও সন্তান ভোগ করে। সুরেনও তেমনি ভারত কোলের কু-কর্মের ফল ভোগ করেছে।

*মহাকালের খাঁড়া* গল্প একদিকে নকশাল আন্দোলনের ক্রিয়া-কলাপকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ঠিক সেরকম আমাদের শেখায় আঙ্গুল তুলতে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে। মিথ্যা চালাকির কাছে মানুষ কতটা তুচ্ছ হয়ে যায়, তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়, এ গল্প তারই দৃষ্টান্ত বহন করে। কায়েস আহমেদ *মহাকালের খাঁড়া* গল্পে নিছক কাহিনীর বর্ণনা, বিশ্লেষণ করেননি। বরং বলেছেন গল্পের মধ্যে অন্য গল্প। বিশেষ সময়ের ঘটনা, মনস্তত্ত্বকে তুলে ধরেছেন গল্পের বয়ানে। যেমন- *অন্তর্নীল চখাচখি* গল্পের মধ্যে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ মুখ্য হয়ে উঠেছে। গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে অন্য আদলে গল্প বলেন কায়েস আহমেদ। এই জন্য তাঁর সৃষ্টি চির নতুন, চিরচঞ্চল।

**তথ্যসূত্র :**

১. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, *গল্পকথা*, 'মরিবার হলো তাঁর সাধ', রাজিয়া খান ও কায়েস আহমেদ যৌথ সংখ্যা, বর্ষ ৮ সংখ্যা ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩৫৬
২. আহমেদ, কায়েস, *কায়েস আহমেদ সমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রকাশ- ২০১৪, পৃ. ১২৬
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

**গ্রন্থপঞ্জি :**

১. আহমেদ, কায়েস, *কায়েস আহমেদ সমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ২০১৪
২. ঘোষ, নির্মল, *নকশাল আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*। করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৩৮৮

৩. ঘোষ, ফটিকচাঁদ, *নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০১২
৪. চক্রবর্তী, আলোক, *আখ্যানের তত্ত্বভুবন*, আশাদীপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর, ২০২১
৫. চক্রবর্তী, সুধীর, *আখ্যানের খোঁজে*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ১৪১৬
৬. দত্ত, সুকান্তি, *আখ্যানের আলোছায়া*। নীলরোহিত, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১২
৭. দাশগুপ্ত, রাহুল, *আখ্যানের দুনিয়া*। এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১০
৮. দাস, অমিতাভ, *আখ্যানতত্ত্ব*, ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর, ২০১০
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *পুতুল নাচের ইতিকথা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- ১৯৩৬
১০. ভট্টাচার্য, তপোধীর, *আখ্যানের সাতকাহন*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০০৫
১১. লাহিড়ী, রণবীর, *আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান*, চর্চাপদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০১১
১২. হক, আজিজুল, *নকশালবাড়ি: তিরিশ বছর আগে এবং পরে*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২
১৩. ভট্টাভার্য, বিশ্বনাথ (সম্পা.), *পরিচয়*, আখ্যান ও আখ্যানতত্ত্ব, বর্ষ- ৮৫, সংখ্যা ২য়, কলকাতা, নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি, ২০১৬-২০১৭
১৪. Bal, Mieke. *Narratogogy:Introduction to Theory of Narrative.* University of Toronto. Toronto. First Edition- 1985
১৫. Phelan, James & petar, J Rabinowitz. *A Companion to Narrative Theory.* Blackwell Publishing. USA. First Edition- 2005